সূফী
ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন
কার্তিক ১৪২২, অক্টোবর ২০১৫, জিলহজ ১৪৩৬

সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

এ শরীরের মধ্যে পাঁচটি শক্তি বিরাজ করছে। এ শরীরের যখন মৃত্যু হয় তখন সে পাঁচটি শক্তি যার যার নির্দিষ্ট গন্তব্যে চলে যায়। এ পাঁচটি শক্তির সঙ্গে দেহের আনাসিরের কোনো মিল নেই। সে জন্যই দেহ পড়ে থাকে। শক্তিগুলো চলে যায়।

** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ প্রণীত হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহঃ) সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন "সংলাপ সমগ্র" গ্রন্থটি পুনরায় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক সংকলন 'সূফী'-তে ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে। তাঁর (প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ) সদয় অনুমতি নিয়েই আপনাদের সামনে আবার 'সংলাপ'গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। **

তোমার প্রেমেই আমার মুক্তি

আমীন : হুজুর, আজকে একটা নাজুক জিনিস সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই।

গুরু : স্বচ্ছন্দে। বলো কী বলতে চাও।

আমীন : হুজুর, কোনো কোনো মুসলমান রাসুলে পাকের (সা.) মহব্বত এবং তাঁর মোকাম এবং মর্যাদা সম্পর্কে কিছু কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। দরুদ শরিফ সম্পর্কে কোনো কোনো দেশে, কোনো কোনো ফেরকার মুসলমান দ্বিধাগ্রস্ত। তারা এটাকে শিরক মনে করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একমাত্র দরুদে ইব্রাহিম ছাড়া অন্য কোনো দরুদ পাঠ করাকে তারা বারণ করেন। দালায়েলুল খায়রাত নামে যে দরুদের বইটি আছে তা নিয়ে একজন মুসলমান ভাইকে সৌদি আরবে ঢুকতে দেয়া হয়নি। বইটি তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হয়েছিল।

গুরু : দেখো, ইসলাম কোনো দেশের সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। কোনো দল দ্বারা নির্দেশিত নয়। আমাদের সামনে রাসুলে পাক (সা.) কুরআন এবং তাঁর নিজের বাণী এবং এই সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনচর্যাকে রেখে গেছেন। আমরা নিয়ন্ত্রিত হবো একমাত্র তাঁর দ্বারা। এখন এসো দেখি দরুদ সম্পর্কে আমাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত। প্রথম কথা হচ্ছে রাসুলে পাকের এত্তেবা ছাড়া, তাঁর মহব্বত ছাড়া তুমি ইমানদার হতে পারো না। সুরা আহযাবের ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে– আন্নাবিউ আউলা বিল মুমেনিনা মিন আনফুসিহিম– অর্থাৎ মুমিনদের কাছে নবী তাঁদের প্রাণের চেয়ে প্রিয়। সুরা আল-ইমরানের ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে– কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহবিব কুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফিরলাকুম জুনুবাকুম– অর্থাৎ বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার অনুকরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। সুতরাং আল কুরআন সুস্পষ্টভাবে নবীর শান এবং মর্যাদা নির্দেশ করে দিচ্ছে। দুটি আয়াতেই ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। প্রথম আয়াতে রাসুলের প্রেমকে মুমিনের জীবনের চাইতে বড় বলা হচ্ছে– সেই মুমিনকেই শেষোক্ত আয়াতে বলা হচ্ছে তাঁর আল্লাহর মহব্বতের শর্ত হচ্ছে রাসুলের অনুসরণ বা এত্তেবা যা ছাড়া আল্লাহর ভালোবাসা কিংবা ক্ষমা কোনোটাই মিলবে না। এবার বলো দেখি আল কুরআন দরুদ সম্পর্কে কী বলে। এরশাদ হচ্ছে– ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আ'লান্নবি ইয়া আইউহাল্লাজিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা, (সুরা আহযাব, আয়াত নং ৫৬) অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ নবীর ওপর সালাম প্রেরণ করেন, হে মুমিনগণ তোমরাও তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো। সুতরাং যে দরুদ আল্লাহ স্বয়ং নবীর ওপর প্রেরণ করেন– ফেরেশতাকুল প্রেরণ করেন– সে দরুদ সম্পর্কে কোনো ভ্রান্ত ধারণা কোনো মুমিনই পোষণ করতে পারে না। মনে রাখবে দরুদ শুরু হয় ইসমে আজম দিয়ে– হয় বলা হবে সাল্লাল্লাহ কিংবা বলা হবে আল্লাহুমা। সুতরাং এক্ষেত্রে দরুদ শিরক হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যে দরুদ ইসমে আজম দিয়ে শুরু হয় না সেটা দোয়া হতে পারে, দরুদ নয়। দেখো, প্রেম কোনো আইন মানে না। ওয়ালেহানা প্রেম আইনের তোয়াক্কাও করে না। রাসুলের (সা.) প্রেমকে যদি কেউ শিরক বলে তবে আমি সে শিরক করতে রাজি আছি। হযরত আলী থেকে বর্ণিত একটি কথা আছে। হযরত আলী (রা.) বলেছেন, যদি আল্লাহর জিকির ফরজ না হতো তাহলে আমি সমস্ত এবাদত বাদ দিয়ে কেবল দরুদ পাঠ করতাম (বোখারি)। হযরত বড়পীর মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানি (রহ.) বলেছেন– দরুদ শরিফের জন্যই আমি গওসুল আজম হয়েছি।

আমীন : হুজুর, আর একটা বলা হয়, মক্কা শরিফ ছাড়া আর কোথাও নিয়ত করে যাওয়া যায় না। সেটাও শিরক। তাহলে কি রাসুলের (সা.) রওজা মুবারক জিয়ারত শিরক হবে? যাঁরা ওলি-আল্লাহদের মাজার জিয়ারতকে মাজার পূজা বলেন, শিরক বলেন, তাদের যুক্তি তো সেইদিকেই ইঙ্গিত করে।

গুরু : মাজার জিয়ারত এবং মাজার পরস্তি এক জিনিস নয়। রাসুলে পাক (সা.) কবর জিয়ারত করতেন– ফাতেহা পড়তেন। সুতরাং মাজার জিয়ারত শরিয়ত বহির্ভূত কোনো কাজ নয়। কিন্তু কেউ যদি মাজারে শায়িত ব্যক্তিটির কাছে কিছু চেয়ে বসে তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে সেটা শিরক। তেমনটা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। কিন্তু মাজারে শায়িত ওলির অসিলায় আল্লাহর কাছে রহমত, বরকত তো মানুষ চাইতেই পারে। রাসুলে পাককে আমরা হায়াতুন্নবি বলি– তাকে জীবিত বলি। তিনি নিজেও বলেছেন– সমস্ত আম্বিয়া জীবিত এবং তাঁরা নামাজ পড়েন। রাসুলে পাক আরো বলেছেন– যারা মক্কায় হজ করতে আসবে তারা যখন আমার কবর জিয়ারত করতে আসবে তখন তারা যেন আমাকে জীবিত মনে করে আসে। যারা হজ করতে এসে আমার কবর জিয়ারত করবে না তাদের আমি কিয়ামতে শাফায়াত করবো না। আর যে উম্মত হজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলো না– সে হাজি আমার না– (বোখারি)। রাসুলে পাক যদি তাঁর উম্মতকে অস্বীকার করেন তাহলে কুরআনের আলোকেই একথা নিশ্চিত যে আল্লাহও তাঁকে অস্বীকার করবেন।

মদিনা জিয়ারত সম্পর্কে আরো কয়েকটি হাদিস শোন। রাসুলে পাক বলেছেন– যদি কেউ আমার মদিনা দেখার জন্য মদিনার সীমানায় আসলো, আমি তার জন্য কিয়ামতে শাফায়াত চাইবো। মুসলিম শরিফের আর একটি হাদিসে রাসুলে পাক বলছেন– যারা মক্কায় হজ করলো এবং স্বেচ্ছায় মদিনায় এসে আমার জিয়ারত করলো তাদের দুবার হজের সওয়াব মিলবে।

সুতরাং রাসুলে পাকের মহব্বতকে যারা শিরক মনে করে তাদের বলে দিও– অরূপকে চিনেছি যার কথায় বিশ্বাস করে তাঁর প্রেম শিরক হতে পারে না। অরূপ যাঁর মাধ্যমে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন তাঁর প্রেমেই মুক্তি। তাঁকে বাদ দিলে কোনো বিশ্বাসও থাকে না। এজন্যই তাঁর এত্তেবাকে আল্লাহর এত্তেবা বলা হয়েছে। আল্লাহর প্রেম পেতে হলে রাসুলের প্রেম অর্জন করতে হবে। দেখো, অন্যসব নবী-রাসুলদের কথা শুনতে বলা হয়েছে– কিন্তু কোনো ধর্মেই তাঁর নবীর চরিত্রকে অনুসারীদের অবশ্য অনুকরণীয় জিনিস বলা হয়নি। বলা হয়েছে আল্লাহর রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নাও। কিন্তু আল্লাহর কি কোনো রঙ আছে? অরূপের আবার রূপ কী? তাই বলা হয়েছে অরূপের রঙে রাঙা হতে চাইলে রাসুলের রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নাও। তবেই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দেবে। ■

তাওহিদী অনুভূতির ব্যাপ্তি-সীমা

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার সিদ্দিকী

আল্লাহর বিভিন্ন মাখলুক বিভিন্ন প্রকারের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ ও আনন্দে ভরা এবং সেগুলো উপভোগ ও উপলব্ধির জন্য মানব দেহে তিনি বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করেছেন। এক অঙ্গের কাজ অন্য অঙ্গ দিয়ে চলে না। সৌন্দর্য উপভোগ করা চোখ দিয়ে সম্ভব, সুগন্ধ উপভোগ করা নাক দিয়ে সম্ভব, কোমল বস্তুর স্পর্শসুখ উপভোগ করা হাত দিয়ে সম্ভব, মানব-জীবনে চরম পুলকের উপলব্ধি যে যৌন-মিলনে হয়, তা নর-নারীর যৌনাঙ্গ দিয়ে সম্ভব, বস্তুর স্বাদ গ্রহণ শুধু রসনা দিয়ে সম্ভব। এতসব বৈচিত্র্যের খালেক যে আল্লাহ, তাঁকে উপলব্ধি করা যায় শুধু হৃদয় দিয়ে এবং হৃদয় পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত হয় সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে। তাসাউফের ভাষায় এটাই 'কালব জারি' হওয়া অবস্থা। অনুভূতি ও উপলব্ধি (feelings) হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার মিলনের একমাত্র মাধ্যম।

আল্লাহ বলে কেউ বা কিছু নেই এরূপ চিন্তা অথবা তাঁর সম্বন্ধে কিছুমাত্র অনুভূতিও চেতনা হৃদয়ে না রাখা– এই উভয় অবস্থায় মানুষের মন-মগজ ক্রমে অসীম শূন্যতায় ভরে ওঠে। পায়ের নিচে দাঁড়াবার অবলম্বন না পেলে যেমন একজন মানুষ ক্রমাগত ডুবতেই থাকে, তার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাকে ধরে রাখতে পারে না, তেমনিভাবে নাস্তিক ও ধর্মহীন ব্যক্তিদের বিদ্যা-বুদ্ধি ইমানের ভিত্তিভূমির অভাবে তাদের পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। ইমানহীন কাফের ও মুনাফেক ব্যক্তির জীবন বাত্যাতাড়িত মরুভূমির মতোই স্থিতিহীন, সতত সঞ্চরণশীল এবং অসহায়। যাদের সৃষ্টি কখনো কল্যাণধর্মী হতে পারে না। দুনিয়ার ইতিহাসে মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ-কামনায় কাফের ও মুনাফেকের কোনো দান নেই।

পক্ষান্তরে ইমানের ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে মুমিন বান্দার যাবতীয় কর্ম প্রতিভা ক্রমাগত কল্যাণ-মাধুরী লাভ করে মহিমাময় হয়ে ওঠে। মানুষের সমস্ত চিন্তা-ভাবনার উৎসমূল যে হৃদয় বা দিল, সেটা যদি ইমানের নূরে ক্রমাগত বেশি আলোকিত হতে থাকে, তখন ব্যক্তির যাবতীয় গুণ সদগুণে পরিণত হয় এবং সৎচিন্তা ও সৎকাজ ছাড়া তার দ্বারা অন্য কিছুই সাধিত হয় না। মুহূর্তের ভুলে কোনো অন্যায় কাজ তার দ্বারা সংঘটিত হলেও তওবা করে দ্বিগুণভাবে তিনি সৎকাজ সম্পন্ন করেন। এমনকি দুনিয়ার যাবতীয় ছোট-বড় ব্যাপার, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মেলামেশা, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে সংসারধর্ম পালন– সমস্তই আল্লাহর অনুভূতি-সিক্ত হয়ে নিষ্কামভাবে সম্পন্ন হয়। এ অবস্থার বর্ণনা করে নূরনবী (সা.) বলেছেন–

'যে ব্যক্তি আল্লাহরই জন্য কোনো ব্যক্তি ও বস্তুকে ভালোবাসে, আল্লাহরই জন্য ঘৃণা করে, আল্লাহরই জন্য দান করে এবং আল্লাহরই জন্য দান করতে বিরত থাকে, তার ইমান পূর্ণতা লাভ করেছে।'

মনের এই অপার্থিব পবিত্র ভাবধারা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, মুমিন বান্দা ততই শান্তি পিয়াসী এবং আলোকধর্মী হয়ে উঠতে থাকেন। একটি হাদিসে কুদসিতে হুজুর (সা.) আরো বলেছেন–

'আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা সব সময় নফল কাজের অনুষ্ঠান করে আমার কাছাকাছি হতে চায়। এতে করে আমি তাকে ভালোবাসি। আমি যখন তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে'।'

মুমিন বান্দার এই আলোক-সাধনা সঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে কিনা সেটা পরীক্ষার একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে নবী করিম (সা.) প্রতিষ্ঠিত শরিয়ত। শরিয়ত বিরোধী কাজ করেও কোনো কোনো ভণ্ডপীর বা ব্যক্তি (Vulgar mystics) আধ্যাত্মিক উন্নতির দাবি করতে পারে, কিন্তু সেটা আলোক নয়, আলেয়া; উন্নতি নয়, অবনতি এবং জান্নাতের পথ নয় জাহান্নামের পথ।

মুমিন বান্দার আত্মিক উন্নতির সীমার ইঙ্গিত দান করে আল্লাহ পাক বলেছেন–

'আমার বান্দাদের সত্বরই আমার করুণার চিহ্নসমূহ দেখিয়ে দেই– আকাশসহ অসীম শূন্যমণ্ডল এবং তাদের নিজ দেহের মধ্যেও।'

মানব দেহ হচ্ছে এক একটি ক্ষুদ্র বিশ্ব। আল্লাহর আয়াতসমূহ সেখানে বিরাজ করছে সীমা ও অসীমের মাঝে সেতুবন্ধনরূপে। আল্লাহ পাকের এই বাণীর মর্মার্থ লাভ হয় একমাত্র দিলের শক্তি তথা অনুভূতি ও উপলব্ধি শক্তি বৃদ্ধি করে। এই শক্তি লাভের জন্য আহলে-তাসাউফ অর্থাৎ ওলি-আল্লাহদের সাহায্য গ্রহণ করতেই হবে। কারণ কিতাবি ইলম মানুষের মগজে চিন্তাশক্তি বাড়াতে পারে, কালবের শক্তি তথা উচ্চতম বোধশক্তি সেটা দিয়ে বাড়ে না। ইলম এবং আমল অর্থাৎ জ্ঞান ও আত্মিক সাধনা– এ দুটো মিলিত না হলে আল্লাহ, নবী, কুরআন এবং কুরআন বর্ণিত বিষয়গুলোর অন্তর্নিহিত হাকিকত বুঝতে পারা যায় না। অতীতে এবং বর্তমানে শুধু কিতাবি আলেমরা দ্বীন-ই-ইসলামের উন্নতির নামে ইসলাম ও মুসলমান জাতির অবনতি ঘটিয়েছেন এবং ঘটাচ্ছেন। আবার কিতাবি জ্ঞান বর্জিত একদল মূর্খ ফকির 'দিল কুরআন'-এর নামে মানুষকে জাহান্নামি বানাচ্ছে। পক্ষান্তরে যাঁরা আলেম ও সাধক, তাঁদের নিষ্ঠা ও একাগ্র সাধনা দিয়ে ইসলামের সঠিক ভাবধারা (ideology) কায়েম আছে। যেমন পর্বতশ্রেণি দিয়ে টলটলায়মান পৃথিবী পানির ওপর টিকে আছে। মানুষের হৃদপিণ্ডের যে ধুক ধুক শব্দ, সেটা ভাষাহীন ক্রিয়ামাত্র নয়। কামেল পীরের সবক লাভ করত মেহনত করতে করতে ওই শব্দ আল্লাহ আল্লাহ শব্দে রূপান্তরিত হয়।

সালিক বান্দা যখন এই পথে যাত্রা শুরু করেন, প্রথমেই কালব লতিফার ওপর মেহনত আরম্ভ করতে হয়। কালব 'তওবার' মাকাম। সুস্থ মানুষের সুস্থ দিল সব সময় আল্লাহ পাকের কাছে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য বিনয়-নম্র ও ক্ষমা প্রার্থনার ভাবসহ আল্লাহ নামের জিকির করতে থাকে। শহর-ভরা বিদ্যুৎ বাতিগুলোর মূলকেন্দ্র যেমন পাওয়ার হাউস, দেহের সব মাকামে আল্লাহ নামের আলোক জ্বালাতেও তেমনি কালবের শক্তির উদ্বোধন প্রয়োজন। (চলবে)

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.) - এর সুফিতত্ত্ববোধিনী কথামৃত সাগর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে

এই গ্রন্থটি সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.) কর্তৃক মারকাজে প্রদত্ত মূল্যবান উপদেশমালা থেকে গ্রন্থিত। এই বইটি সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.) স্মারক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত নয়।

পরিকল্পনা, সংকলন ও সম্পাদনা: প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ।

প্রাপ্তিস্থান : **পাঠক সমাবেশ**, ১৭ ও ১৭/এ (নিচতলা) আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন (মোবাইল) : ০১৮১৯২১৯০৮১।

ডা. হাবিবুর রহমান - মোবাইল : ০১৯১৩৮২০৭৫৬

আয়েশা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২২১/১, বাইতুর রহিম জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, পূর্ব মনিপুর (নুরানি পাড়া), মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

তবুও অনেকে চিন্তা করে: মানুষ কি পশু থেকে এসেছে? কিন্তু এটা পরিষ্কার যে পশুকে মানুষের স্তরে টেনে তোলা যায় না। পশু পশুই, আর মানুষ মানুষই। অতএব, মানুষের ধর্মের ভিত্তি এই দুটোই – নৈতিক মূল্যবোধ আর সৃষ্টি-রহস্যকে জানার প্রবল ইচ্ছা। মানুষ প্রত্যেকটি বস্তু ও বিষয়ের Ultimate Truth বা চূড়ান্ত সত্য জানতে চায়। এই জানার ওপর নির্ভর করে তার মূল্যবোধের মাপকাঠি। মানুষ যখন জানতে পারে, সে এখানে কেন এসেছে, কে তাকে এখানে পাঠিয়েছে, কোন উদ্দেশ্যে তাকে এখানে পাঠিয়েছে, তখন তার কার্যকলাপ এক বিশেষ মূল্যবোধের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ, চূড়ান্ত বাস্তবতাকে না জানা পর্যন্ত মানুষের মূল্যবোধ ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়।

স্পেনবাসী দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে ইন্কা ও অ্যাযটেক সভ্যতার সন্ধান পেলো। তাদেরও মন্দির ও পুরোহিত ছিল। বিভিন্ন ধরনের ভগবানের ধারণা ছিল। পরম সৃষ্টিকর্তার ধারণা ছিল। একজন নবীর ধারণাও ছিল, যিনি তাদের শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। এখান থেকেই চলে আসে ধর্মের তৃতীয় ভিত্তির ধারণা। সব মানব সমাজকেই এই কথার ওপর জোর দিতে দেখা যায় যে, অতীতে একজন মহামানব তাদের শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। যেমন, হিন্দুদের রামায়ণ ও মহাভারত শিক্ষা দিতে এসেছিলেন যথাক্রমে বাল্মীকি ও ব্যাস। পারস্যবাসীর শিক্ষক ছিলেন জরাথ্রুস্ট। এভাবেই মিসরবাসী, রোমক ও গ্রিকরাও অতীতের মহাগুরুদের কথা বলে।

মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অনেক কিছু বোঝে, সে অনেক মেধাবান, কিন্তু তার এই গুণগুলোকে জাগিয়ে তোলার জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন– ঠিক যেমন ভালো মাটি, ভালো সিঞ্চন আর সূর্যের আলো পেলেই একটা বীজ ফলদায়ক গাছে পরিণত হয়, নইলে নয়। মানব শিশুও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে পশুর পর্যায়ে থেমে থাকতে পারে। শিক্ষা পেলে সে অনেক ওপরে উঠতে পারে। বলা যায় যে মানুষ তার বাবা-মা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে অনেক কিছু শেখে, এবং পরবর্তীতে অনেকটা তাদের মতো হয়ে ওঠে। তবে নৈতিক বিধিনিষেধ এবং সৃষ্টির চূড়ান্ত সত্য কী– যেমন কে এসব সৃষ্টি করেছে, কে এগুলোকে সাজিয়েছে, কে এগুলোর নিয়ন্ত্রণ করে, কে মানুষের কাজের বিচার করবে, ইত্যাদি– প্রত্যেক সমাজে মানুষ এসব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর কোনো না কোনো মহাগুরুর কাছ থেকে পেয়েছে। এরাই ছিলেন নবী। প্রত্যেক সমাজে তারা ধারাবাহিকভাবে এসেছেন। এমনও সমাজ থাকতে পারে, জানা ইতিহাসে যাদের সাথে অন্যান্য সমাজের কোনো যোগাযোগ হয়নি– সেখানেও নবীরা এসেছেন; আল্লাহ বলেছেন: প্রত্যেক উম্মতের জন্যে এক একজন রসুল রয়েছেন। এরা না আসলেও জীবনের মৌলিক বিষয় নিয়ে মানুষ নিশ্চয় চিন্তা করতো, কিন্তু যা সমাজের জন্য কল্যাণকর হতো, এমন বিষয়ে কোনো নবীর সাহায্য ছাড়া কোনো স্পষ্ট সমাধান সে পেতো না। আসলে, সবাই অতীতে আসা কোনো না কোনো শিক্ষক বা নবীর কথা বলে।

অতএব, এতে অবাক হবার কিছুই নেই যখন কেউ বলে যে এক বা একাধিক নবী তাদের নৈতিক আচরণ ও চিরন্তন সত্য সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। এটাই মানুষের জন্য স্বাভাবিক, এবং এটাই চিরকাল ঘটেছে। অবশ্যই আমরা তাদের নবীদের সম্পর্কে খুব কমই জানি, যেমন পারস্যবাসী, ভারতবাসী বা চীনবাসীর অতীত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। চীনবাসী কন্‌ফুশাসের নৈতিক শিক্ষা, আর টাও (Tao) ধর্মের অনুসারীরা লাও-শির (Laozi বা Lao-tzu) আধ্যাত্মিক শিক্ষা আজো মেনে চলে। জীবন দর্শনের সকল প্রশ্নে তারা এসব মনীষীর উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে।

ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নবীদের মধ্যে ইব্রাহিম (আ.) ও তাঁর উত্তরসূরিদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের একটি ধারা ইহুদি বা বনি ইস্‌রাঈল, আর অপর ধারা আরব বা বনি ইস্‌মাঈল নামে পরিচিত। এদের প্রচলিত শিক্ষা গোটা ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তৃত। শুধু চীন, ভারত ও দূরপ্রাচ্যে এদের শিক্ষা আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে। আসল কথা হলো এদের ঘটনাবলি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, কেবলমাত্র পুরাকথায় নয়। আর নৈতিক আচরণ ও চিরন্তন সত্যকে ব্যক্ত করার ব্যাপারে এদের শিক্ষা অন্য সবার চেয়ে অনেক বেশি উন্নতমানের ছিল।

ইব্রাহিম (আ.) ইরাকের অধিবাসী ছিলেন। সেখানে তখন মূর্তিপূজা, নক্ষত্র পূজা, ইত্যাদির প্রচলন ছিল। তাই আল্লাহর নির্দেশে তিনি ফিলিস্তিনে চলে যান। তাঁর কাছ থেকেই আমরা সৃষ্টির উৎস ও স্রষ্টার একত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। তিনিই আমাদের আদম (আ.) থেকে শুরু করে ওনার সময় পর্যন্ত অনেক নবীর কথা জানিয়েছেন। তাঁরা সবাই বলেছেন আল্লাহই আমাদের এই কথাগুলো জানাবার জন্য পাঠিয়েছেন। অতএব নবীদের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর পরিকল্পনার কথা জেনেছি।

আমরা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমেও আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ তুলে ধরতে পারি, কিন্তু তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়, কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এমন সব যুক্তি আবিষ্কার করতে পারেন যা সেই প্রমাণকে খণ্ডন করে দিতে পারে। অতএব যুক্তির মাধ্যমে conviction বা দৃঢ় প্রত্যয় অর্জন করা যায় না; এর জন্য প্রয়োজন evidence বা সাক্ষ্যপ্রমাণের। যেমন, একজন বৈজ্ঞানিক যখন বলেন যে তিনি অণুর বিভিন্ন অংশকে দেখেছেন, তখন আমরা তার সাক্ষ্যপ্রমাণকে মেনে নেই– তিনি যা বলেন আমরা তা মেনে নেই।

ঠিক তেমনি, একজন নবীও বলেন যে তাঁর সাথে সর্বক্ষমতাময় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর যোগাযোগ হয়েছে, এবং তাঁর কাছে আল্লাহর বাণী এসেছে, আর সেই বাণীতে চিরন্তন সত্য বা সৃষ্টির প্রকৃত বাস্তব এবং আমাদের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন। শিক্ষার এই ধারা মানুষের আবির্ভাবের গোড়াতেই শুরু হয়েছিল। ইব্রাহিম (আ.)-এর সময় এটা এক বিস্তারিত রূপ ধারণ করে, এবং মহানবী (সা.)-এর সময় এটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে ইসলামের শিক্ষা অন্য সব ধর্মের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপক। এতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া রয়েছে। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে যেসব সন্দেহ ও অসুবিধা দেখা দিয়েছিল, ইসলাম সেগুলো দূর করেছে। অতএব, একমাত্র বিশ্বজনীন ধর্ম হলো ইসলাম, অর্থাৎ এটিকে বিশেষ কোনো দেশ বা জাতি বা গোত্রের জন্য পাঠানো হয়নি। অন্যান্য ধর্মগুলোও আল্লাহই পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলো ছিল বিশেষ সমাজের সমস্যা দূর করার জন্য, অর্থাৎ সেগুলো ছিল সাম্প্রদায়িক। (চলবে)

মুহাম্মদ আলমগীর: ১৯৪২ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তিনি করাচিতে শিক্ষা জীবন এবং প্রাথমিক কর্মজীবন কাটান। ষাটের দশকে তিনি মরহুম মওলানা ফজলুর রহমান আনসারী (রহ.) এবং মরহুম ড. বুরহান আহমদ ফারুকী (রহ.)-এর সান্নিধ্যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদিতে শিক্ষালাভ করেন। এই লেখাটি তাঁর **কুর'আন সম্মত মুসলিম জীবন** গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

ইসলাম

মুহাম্মদ আলমগীর

কথিত আছে যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসে, তথা এই পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের আবির্ভাব হঠাৎ করেই হয়েছিল। ঠিক কোন সময় তা হয়েছিল সেটা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। এ বিষয়ে বিভিন্ন মনীষীর ধারণা বিভিন্ন রকম। তবে মোটামুটিভাবে তারা সবাই একমত যে, সেটা হঠাৎ করেই হয়েছিল। তার পর থেকে প্রথম মানুষদের ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র, তাদের বাসস্থান, তাদের কবর, ইত্যাদি, সামনে আসতে লাগলো। এসব দেখে বুঝা যায় যে, মানুষের আগমনের ভেতর দিয়ে কোনো এক সময় সৃষ্টির মধ্যে এক নতুন মাত্রা সংযুক্ত হয়েছিল, পশু জগতের সাথে যার কোনো সাদৃশ্য ছিল না।

মানুষের আগে এখানে শুধু পশুরাই বাস করতো। পশুদের কোনো অর্জিত জ্ঞান নেই, অর্থাৎ তাদের কার্যকলাপ instinctive বা সহজাত, প্রবৃত্তিগত। মানুষের সাথে তাদের কিছু দৈহিক মিল রয়েছে, এই যা। মানুষ ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারে, রান্না করে খেতে পারে– যা কোনো পশু করতে পারে না। পশুদের এগুলো শেখানোও যায় না। মানুষ কাপড়-চোপড় তৈরি করে, হাতিয়ার তৈরি করে, ব্যবহারিক সবকিছুই তৈরি করে। অতএব মানুষ আর পশুর মধ্যে এক বিশাল পার্থক্য রয়েছে। মোটকথা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও মেধার দিক দিয়ে মানুষের সাথে পশুর কোনো মিলই নেই।

ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই পার্থক্যগুলো আমাদের আরেক ধাপ ওপরে নিয়ে যায়, যেখানে আমরা দেখি যে মানুষের মধ্যে রয়েছে মূল্যবোধ, অর্থাৎ, সে বস্তুর মূল্যের সাথে সাথে আচার-ব্যবহারেরও মূল্য নিয়ে সচেতন। এটাই হলো নৈতিক মূল্যবোধ, অর্থাৎ ভালো-মন্দের জ্ঞান বা বিচার। এটা আমরা মানুষের মধ্যে সর্বত্রই দেখি, তা সে গভীর জঙ্গলে বাস করুক, অথবা এমন দ্বীপে– যেখানে এখনো কেউ যায়নি, অথবা দ্বীপটি মাত্র ক'দিন আগে আবিষ্কৃত হয়েছে। আমরা সব জায়গাতেই ভালো মানুষকে প্রশংসা করতে দেখি। পৃথিবীর বুকে এই আচরণটা নতুন। পশুদের মধ্যে এই আচরণের প্রাথমিক অবস্থাও দেখা যায় না, এর কোনো আভাস-ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না।

মূল্যবোধ দুই ধরনের। একটার সম্পর্ক বস্তুর মূল্যের সাথে। আমরা চুরি করা বা ছিনিয়ে নেয়ার কথা বলতে পারি। একটা পশু যখন তারই জাতের কোনো পশুর বা অন্য কোনো জাতের কোনো পশুর খাবার কেড়ে নেয়, আমরা বলি না যে পশুটি খারাপ, বা সে বড় ধরনের কোনো অন্যায় করেছে। আমরা জানি এটাই তার জন্য স্বাভাবিক, অর্থাৎ এ কাজটাই তার স্বভাবজাত। কিন্তু মানুষ তা করতে পারে না। সেও জিনিস চুরি করতে পারে, কেড়ে নিতে পারে, এবং জিনিসটি তার কাছে মূল্যবান এবং লাভজনকও হতে পারে। কিন্তু আমরা এই কাজের আরেকটি মূল্য নির্ধারণ করে থাকি। আমরা বলি চুরি করা একটা মন্দ কাজ, অর্থাৎ বস্তুগত মূল্যের সাথে আমরা সেই কাজের নৈতিক মূল্যকেও গুরুত্ব দেই।

অতএব পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাবের মতোই এই নৈতিক মূল্যবোধের আবির্ভাবও একটা নতুন ঘটনা। এই মূল্যবোধ একান্তভাবে মানুষেরই মধ্যে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়– মানুষ ভালো-মন্দ যাই করবে, সেটা বেছে নেয়ার অধিকারও তার রয়েছে, যা পশুদের মধ্যে পাওয়া যায় না। পশুরা তা-ই করে যা তাদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে লাভজনক। তবে মানুষের মধ্যে যেহেতু পশুর স্বভাবও রয়েছে, তাই সে ইচ্ছা করলে পশুর পর্যায়ে নামতে পারে। তাকে যদি শিক্ষা না দেয়া হয়, তাহলে সে ঠিক তাই করে। এমনকি পশুদের দ্বারা পালিত হয়ে মনুষ্য শিশুকে তাদেরই মতো ব্যবহার করতেও দেখা গেছে, এমন উদাহরণও দু-একটা আছে। সেই শিশুর মধ্যে মানুষের মতো গড়ে ওঠার সব সম্ভাবনাই ছিল, কিন্তু সে সেটা বিকাশের কোনো সুযোগ পায়নি, এই যা।

মানুষের সামনে দু'টি পথই খোলা রয়েছে। একদিকে জঙ্গলের আইন, আর অপরদিকে নৈতিক আইন, অর্থাৎ বিধিনিষেধ। নৈতিক আইন মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে, অর্থাৎ তার বিবেক এতে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয় – যা পালন করে সে সন্তুষ্ট হয়, যার বিরোধিতা করে সে অনুতপ্ত হয়। এখানেই চলে আসে তার ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য বা free-will-এর কথা। অর্থাৎ, সেকি জঙ্গলের আইন মেনে চলবে যেখানে নৈতিকতার কোনো বালাই নেই, নাকি নৈতিক আইন মেনে চলবে যেখানে শুদ্ধ-অশুদ্ধের বিধিনিষেধ রয়েছে; এর বিবেচনা সে নিজেই করবে, এবং এর জন্য সে-ই দায়ী হবে।

মোট কথা, পৃথিবীর বুকে এটা নতুন। যেখানেই মানুষ বাস করে, সেখানেই নৈতিক নিয়ম-কানুন দেখা যায়; এতে কোনো ব্যতিক্রম নেই। নিউজিল্যান্ড অথবা দক্ষিণ আমেরিকার দূর প্রান্তের যেসব দেশ মানব সভ্যতার মূল কেন্দ্র থেকে শত শত বছর বিচ্ছিন্ন থেকেছে, সেখানেও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত সমাজের সন্ধান পাওয়া গেছে। স্পেনবাসীর আগে কারা দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছিল, তার কোনো তথ্য আমাদের জানা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই। কিন্তু স্পেনবাসী সেখানে গিয়ে এক সংঘবদ্ধ ও উন্নতমানের নৈতিক সমাজের সন্ধান পেয়েছিল।

এটাই মনুষ্যত্বের প্রথম পরিচয়। মানুষ যা কিছু করে তার একটা নৈতিক মূল্য থাকতেই হবে। তার কাজটি তাৎক্ষণিকভাবে লাভজনক হতে পারে, তবুও প্রশ্ন থেকে যাবে যে সেটি নৈতিকভাবে শুদ্ধ কিনা। এখানেই শেষ নয়। মানুষের দ্বিতীয় আরেকটি পরিচয় হলো এই যে, সে জানতে চায় এই বিশ্বের সৃষ্টির পেছনে কোন পরিকল্পনা কাজ করছে। পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের একটাই প্রশ্ন: এই বিশ্ব এলো কোথা থেকে? যেসব শক্তি একে চালিত রেখেছে, সেগুলোর উৎস কী? মানুষের কী হবে? সৃষ্টির মধ্যে তার পদমর্যাদা কী? চূড়ান্ত সত্যটি কী? এসব চিন্তা পশুদের জন্য স্বাভাবিক নয়। কিন্তু মানুষ, তা সে ধর্মে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর চায়। সে কোনো না কোনো দর্শন গড়ে তোলে, তা সেটা যত উদ্ভটই হোক না কেন। সে মনে করতে পারে সৃষ্টির সবটাই বস্তু বা material, অথবা আত্মা বা spirit, অথবা অবাস্তব বা illusion, অথবা বাস্তব বা real। পশুদের মধ্যে এসব চিন্তার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। এগুলোই হলো মানুষ আর পশুর মধ্যে আসল প্রভেদ। সৃষ্টজগতে পশুর তুলনায় মানুষের অবস্থান অনেক উচ্চ স্তরে। এক্ষণের সমস্যা নিয়ে পশুর চিন্তা, তারা এর বাইরে আর কিছু চিন্তা করে না। সেই যোগ্যতা তাদের নেই। (এরপর পৃষ্ঠা ৩)

■ **প্রধান সম্পাদক :** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, ■ **নির্বাহী সম্পাদক :** নিশাত বদরুল ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৮/১ তেজকুনিপাড়া, ফার্মগেট, হলিক্রস কলেজ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫ থেকে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান : বাইতুর রহিম জামে মসজিদ সংলগ্ন আয়েশা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২২১/১ পূর্ব মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।